রেখেই— আমাদের বাংলাসাহিত্য গড়তে হবে। অবশ্য আমরা সকলেই দোভাষী, আর আমাদের নিত্য কাজই হচ্ছে তরজমা করা। কিন্তু সব্যসাচী হলেও এক তীরে দুই পাখি মেরে উঠতে পারি নে। আমরা যখন বাংলা লিখি, তখন ইংরেজির তরজমা করি— কিন্তু সে না জেনে; আর যখন ইংরেজি লিখি, তখন বাংলার তরজমা করি— সেও না জেনে। কিন্তু এখন থেকে ঐ কাজই আমাদের সজ্ঞানে করতে হবে; মুশকিল তো ঐখানেই। মনোভাবকে প্রথমে বাংলাভাষার কাপড় পরাতে হবে, এই মনে রেখে যে আবার তাকে সে কাপড় ছাড়িয়ে ইংরেজি পোশাক পরিয়ে সুইডিশ অ্যাকাডেমির সুমুখে উপস্থিত করতে হবে। এবং এর দরুন মনোভাবটির চেহারাও এমনি ত'য়ের করতে হবে যে, শাড়িতেও মানায় গাউনেও মানায়।

এক ভাষাতে চিন্তা করাই কঠিন, কিন্তু একসঙ্গে যুগপৎ দুটি ভাষাতে চিন্তা করাটা অসম্ভব বললেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু কায়ক্লেশে আমাদের সেই অসাধ্যসাধন করতেই হবে। একটি বাঙালি আর-একটি বিলেতি— এই দুটি স্ত্রী নিয়ে সংসার পাতা যে আরামের নয়, তা যাঁরা ভুক্তভোগী নন তাঁরাও জানেন। তাছাড়া, এ উভয়ের প্রতি সমান আসক্তি না থাকলে এ দুই সংসার করাও মিছে। সর্বভূতে সমদৃষ্টি, চাই কি, মানুষের হতেও পারে; কিন্তু দুটি পত্নীতে সমান অনুরাগ হওয়া অসম্ভব, কেননা মানুষের চোখ দুটি হলেও হৃদয় শুধু একটি। স্ত্রৈণ হতে হলে একটিমাত্র স্ত্রী চাই। এমনকি, দুই দেবীকে পূজা করতে হলেও পালা করে ছাড়া উপায়ান্তর নেই। অতএব দাঁড়াল এই যে, বছরের অর্ধেক সময় আমাদের বাংলা লিখতে হবে, আর অর্ধেক সময় ইংরেজিতে তার তরজমা করতে হবে। ফিরেফিরতি সেই সুইডেনের কথাই এল; অর্থাৎ আমাদের চিদাকাশে ছমাস রাত আর ছমাস দিনের সৃষ্টি করতে হবে, অথচ দৈবশক্তি আমাদের কারও নেই।

তৃতীয় মুশকিল এই যে, সে তরজমার ভাষা চলতি হলে চলবে না। সে ভাষা ইংরেজি হওয়া চাই, অথচ ইংরেজের ইংরেজি হলেও হবে না। দেশী আত্মা এমনিভাবে বিলেতি দেহে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া চাই, যাতে তার পূর্বজন্মের সংস্কারটুকু বজায় থাকে। ফুল ফোটাতে হবে বিলেতি, কিন্তু তার গায়ে গন্ধ থাকা চাই দেশী কুঁড়ির। প্রজাপতি ওড়াতে হবে বিলেতি, কিন্তু তার গায়ে রং থাকা চাই দেশী পোকার। এককথায়, আমাদের পূর্বের সূর্য পশ্চিমে ওঠাতে হবে। এহেন অঘটন-ঘটন-পটিয়সী বিদ্যা অবশ্য আমাদের নেই।

কাজেই যে কার্য আমরা একদিন বাংলায় করতে চেষ্টা করে অকৃতকার্য হয়েছি— রবীন্দ্রনাথের লেখার অনুকরণ— তাই আবার দোকর করে ইংরেজিতে করতে হবে।

ইউরোপে আসল জিনিসটা গ্রাহ্য হচ্ছে বলে নকল জিনিসটিও যে গ্রাহ্য হবে, সে আশা দুরাশা মাত্র। ইউরোপ এদেশে মেকি চালায় বলে আমরাও যে সেদেশে মেকি চালাতে পারব— এমন ভরসা আমার নেই।

ফলে, আমরা সাদাকে কালো আর কালোকে সাদা যতই কেন করি নে, আমাদের পক্ষে নোবেল প্রাইজ ছিকেয় তোলা রইল। কিন্তু যদি পাই? বিড়ালের ভাগ্যে সে ছিকে যদি ছেঁড়ে। সেও আবার বিপদের কথা হবে। নোবেল প্রাইজ পাওয়ার অর্থে শুধু অনেকটা টাকা পাওয়া নয়, সেইসঙ্গে অনেকখানি সম্মান পাওয়া। অনর্থ এক্ষেত্রে অর্থ নয়, কিন্তু তৎসংসৃষ্ট গৌরবটুকু। বাংলা লিখে আমরা কি অর্থ কি গৌরব, কিছুই পাই নে। বাংলাসাহিত্যে আমরা ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াই, এবং পুরস্কারের মধ্যে লাভ করি তার চাট্টুকু। স্বদেশীর শুভ-ইচ্ছার ফুলচন্দন কালেভদ্রেও আমাদের কপালে জোটে না বলে ইউরোপ যদি উপযাচী হয়ে আমাদের মাথায় সাহিত্যের ভাইফোঁটা দেয়, তাহলে তার ফলে আমাদের আয়ুর্বৃদ্ধি না হয়ে হ্রাস হবারই সম্ভাবনা বেড়ে যায়।

প্রথমেই দেখুন যে, নোবেল প্রাইজের তারের সঙ্গেসঙ্গেই আমরা শত শত চিঠি পাব। এবং এই অসংখ্য চিঠি পড়তে এবং তার উত্তর দিতেই আমাদের দিন কেটে যাবে, সাহিত্য পড়বার কিংবা গড়বার অবসর আর আমাদের থাকবে না। এককথায় সমাজের খাতিরে, ভদ্রতার খাতিরে, আমাদের সাহিত্যের ফুলফল ছেড়ে শুধু শুষ্কপত্র রচনা করতে হবে। এই কারণেই বোধ হয় লোকে বলে যে, নোবেল প্রাইজ লাভ করার অর্থ হচ্ছে সাহিত্যজীবনের মোক্ষ লাভ করা।

আর এক কথা, টাকাটা অবশ্য ঘরে তোলা যায় এবং দিব্য আরামে উপভোগ করা যায়, কিন্তু গৌরব-জিনিসটে ওভাবে আত্মসাৎ করা চলে না। দেশসুদ্ধ লোক সে গৌরবে গৌরবান্বিত হতে অধিকারী। শাস্ত্রে বলে 'গৌরবে বহুবচন'; কিন্তু তার কত অংশ নিজের প্রাপ্য, আর কত অংশ অপরের প্রাপ্য— সেসম্বন্ধে কোনো-একটা নজির নেই বলে এই গৌরব-দায়ের ভাগ নিয়ে স্বজাতির সঙ্গে একটা জ্ঞাতিবিরোধের সৃষ্টি হওয়া আশ্চর্য নয়। অপরপক্ষে যদি একের সম্মানে সকলে সমান সম্মানিত জ্ঞান করেন, এবং সকলের মনে কবির প্রতি অকৃত্রিম ভ্রাতৃভাব জেগে ওঠে— তাতেও কবির বিপদ আছে। ত্রিশ দিন যদি বিজয়াদশমী হয়, এবং ত্রিশকোটি লোক যদি আত্মীয় হয়ে ওঠেন, তাহলে নররূপধারী একাধারে তেত্রিশকোটি দেবতা ছাড়া আর কারও পক্ষে অজস্র কোলাকুলির বেগ ধারণ করা অসম্ভব। ও অবস্থায় রক্তমাংসের দেহের মুখ থেকে সহজেই এইকথা বেরিয়ে যায় যে 'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি'।

এবং ওকথা একবার মুখ ফসকে বেরিয়ে গেলে তার ফলে কবিকে কেঁদে মরতে হবে।

তাই বলি, আমাদের বাঙালি লেখকদের পক্ষে নোবেল প্রাইজ হচ্ছে দিল্লির লাড্ডু—যো খায়া ওভি পস্তায়া, যো না খায়া ওভি পস্তায়া।

মাঘ ১৩২০

সবুজপত্র

বাংলাদেশ যে সবুজ, একথা বোধ হয় বাহ্যজ্ঞানশূন্য লোকেও অস্বীকার করবেন না। মা'র শস্যশ্যামলরূপ বাংলার এত গদ্যেপদ্যে এতটা পল্লবিত হয়ে উঠেছে যে, সে বর্ণনার যাথার্থ্য বিশ্বাস করবার জন্য চোখে দেখবারও আবশ্যক নেই। পুনরুক্তির গুণে এটি সেই শ্রেণীর সত্য হয়ে দাঁড়িয়েছে, যার সম্বন্ধে চক্ষুকর্ণের যে বিবাদ হতে পারে, এরূপ সন্দেহ আমাদের মনে মুহূর্তের জন্যও স্থান পায় না। এক্ষেত্রে সৌভাগ্যবশত নাম ও রূপের বাস্তবিকই কোনো বিরোধ নেই। একবার চোখ তাকিয়ে দেখলেই দেখা যায় যে, তরাই হতে সুন্দরবন পযন্ত এক ঢালা সবুজবর্ণ দেশটিকে আদ্যোপান্ত ছেয়ে রেখেছে। কোথাও তার বিচ্ছেদ নেই, কোথাও তার বিরাম নেই। শুধু তাই নয়, সেই রং বাংলার সীমানা অতিক্রম করে উত্তরে হিমালয়ের উপরে ছাপিয়ে উঠেছে ও দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের ভিতর চারিয়ে গেছে।

সবুজ, বাংলার শুধু দেশজোড়া রং নয়— বারোমেসে রং। আমাদের দেশে প্রকৃতি বহুরূপী নয়, এবং ঋতুর সঙ্গেসঙ্গে বেশ পরিবর্তন করে না। বসন্তে বিয়ের কনের মত ফুলের জহরতে আপাদমস্তক সালংকারা হয়ে দেখা দেয় না, বর্ষার জলে শুচিস্নাতা হয়ে শরতের পূজার তসর ধারণ করে আসে না, শীতে বিধবার মত সাদা শাড়িও পরে না। মাধব হতে মধু পর্যন্ত ঐ সবুজের টানা সুর চলে; ঋতুর প্রভাবে সে সুরের যে রূপান্তর হয়, সে শুধু কড়িকোমলে। আমাদের দেশে অবশ্য বর্ণের বৈচিত্র্যের অভাব নেই। আকাশে ও জলে, ফুলে ও ফলে আমরা বর্ণগ্রামের সকল সুরেরই খেলা দেখতে পাই। কিন্তু মেঘের রং ও ফুলের রং ক্ষণস্থায়ী; প্রকৃতির ওসকল রাগরঙ্গ তার বিভাব ও অনুভাব মাত্র। তার স্থায়ী ভাবেব, তার মূল রসের পরিচয় শুধু সবুজে। পাঁচরঙা ব্যভিচারীভাবসকলের সার্থকতা হচ্ছে বঙ্গদেশের এই অখণ্ডহরিৎ স্থায়া ভাবটিকে ফুটিয়ে তোলা।

এরূপ হবার অবশ্য একটা অর্থ আছে। বর্ণমাত্রেই ব্যঞ্জন বর্ণ; অর্থাৎ বর্ণেব উদ্দেশ্য শুধু বাহ্যবস্তুকে লক্ষণান্বিত করা নয়, কিন্তু সেই সুযোগে নিজেকেও ব্যক্ত করা। যা স্বপ্রকাশ নয়, তা অপর কিছুই প্রকাশ করতে পারে না। তাই রং রূপও বটে, রূপকও বটে। যতক্ষণ আমাদের বিভিন্ন বর্ণের বিশেষ ব্যক্তিত্বের জ্ঞান না জন্মায়, ততক্ষণ আমাদের প্রকৃতির বর্ণপরিচয় হয় না এবং আমরা তার বক্তব্য কথা বুঝতে পারি.নে। বাংলার সবুজপত্রে যে সুসমাচার লেখা আছে, তা পড়বার জন্য প্রত্নতাত্ত্বিক হবার আবশ্যক নেই— কারণ সে লেখার ভাষা বাংলার প্রাকৃত। তবে আমরা সকলে

যে তার অর্থ বুঝতে পারি নে, তার কারণ হচ্ছে যিনি গুপ্ত জিনিস আবিষ্কার করতে ব্যস্ত, ব্যক্ত জিনিস তাঁর চোখে পড়ে না।

যাঁর ইন্দ্রধনুর সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় আছে আর তার জন্মকথা জানা আছে, তিনিই জানেন যে, সূর্যকিরণ নানা বর্ণের একটি সমষ্টিমাত্র এবং শুধু সিধে পথেই সে সাদা ভাবে চলতে পারে। কিন্তু তার সরল গতিতে বাধা পড়লেই সে সমষ্টি ব্যস্ত হয়ে পড়ে, বক্র হয়ে বিচিত্র ভঙ্গি ধারণ করে, এবং তার বর্ণসকল পাঁচ বর্গে বিভক্ত হয়ে যায়। সবুজ হচ্ছে এই বর্ণমালার মধ্যমণি, এবং নিজগুণেই সে বর্ণ-রাজ্যের কেন্দ্রস্থল অধিকার ক'রে থাকে; বেগুনি কিশলয়ের রং, জীবনের পূর্বরাগের রং; লাল রক্তের রং, জীবনের পূর্ণরাগের রং; নীল আকাশের রং, অনন্তের রং; পীত শুষ্কপত্রের রং, মৃত্যুর রং। কিন্তু সবুজ হচ্ছে নবীন পত্রের রং, রসের ও প্রাণের যুগপৎ লক্ষণ ও ব্যক্তি; তার দক্ষিণে নীল আর বামে পীত, তার পূর্বসীমায় বেগুনি আর পশ্চিমসীমায় লাল। অন্ত ও অনন্তের মধ্যে, পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে, স্মৃতি ও আশার মধ্যে মধ্যস্থতা করাই হচ্ছে সবুজের, অর্থাৎ সরস প্রাণের স্বধর্ম।

যে বর্ণ বাংলার ওষধিতে ও বনস্পতিতে নিত্য বিকশিত হয়ে উঠছে, নিশ্চয় সেই একই বর্ণ আমাদের হৃদয়-মনকেও রঙিয়ে রেখেছে। আমাদের বাহিরের প্রকৃতির যে রং, আমাদের অন্তরের পুরুষেরও সেই রং। একথা যদি সত্য হয়, তাহলে সজীবতা ও সরসতাই হচ্ছে বাঙালির মনের নৈসর্গিক ধর্ম। প্রমাণস্বরূপে দেখানো যেতে পারে যে, আমাদের দেবতা হয় শ্যাম নয় শ্যামা। আমাদের হৃদয়-মন্দিরে রজতগিরিসন্নিভ কিংবা জবাকুসুমসংকাশ দেবতার স্থান নেই; আমরা শৈবও নই, সৌরও নই।

আমরা হয় বৈষ্ণব, নয় শাক্ত। এ উভয়ের মধ্যে বাঁশি ও অসির যা প্রভেদ, সেই পার্থক্য বিদ্যমান; তবুও বর্ণসামান্যতার গুণে শ্যাম ও শ্যামা আমাদের মনের ঘরে নির্বিবাদে পাশাপাশি অবস্থিতি করে। তবে বঙ্গসরস্বতীর দূর্বাদলশ্যামরূপ আমাদের চোখে যে পড়ে না, তার জন্য দোষী আমরা নই, দোষী আমাদের শিক্ষা। একালের বাণীর মন্দির হচ্ছে বিদ্যালয়। সেখানে আমাদের গুরুরা এবং গুরুজনেরা যে জড় ও কঠিন শ্বেতাঙ্গী ও শ্বেতবসনা পাষাণমূর্তির প্রতিষ্ঠা করেছেন, আমাদের মন তার কায়িক এবং বাচিক সেবায় দিন-দিন নীরস ও নির্জীব হয়ে পড়ছে। আমরা যে নিজের আত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করি নে, তার কারণ আমাদের নিজের সঙ্গে আমাদের কেউ পরিচয় করিয়ে দেয় না। আমাদের সমাজ ও শিক্ষা দুই আমাদের ব্যক্তিত্বের বিরোধী। সমাজ শুধু একজনকে আর-পাঁচজনের মত হতে বলে, ভুলেও

কখনো আর-পাঁচজনকে একজনের মত হতে বলে না। সমাজের ধর্ম হচ্ছে প্রত্যেকের স্বধর্ম নষ্ট করা। সমাজের যা মন্ত্র, তারই সাধনপদ্ধতির নাম শিক্ষা। তাই শিক্ষার বিধি হচ্ছে 'অপরের মত হও', আর তার নিষেধ হচ্ছে 'নিজের মত হয়ো না'। এই শিক্ষার কৃপায় আমাদের মনে এই অদ্ভুত সংস্কার বদ্ধমূল হয়ে গেছে যে, আমাদের স্বধর্ম এতই ভয়াবহ যে তার চাইতে পরধর্মে নিধনও শ্রেয়। সুতরাং কাজে ও কথায়, লেখায় ও পড়ায়, আমরা আমাদের মনের সরস সতেজ ভাবটি নষ্ট করতে সদাই উৎসুক। এর কারণও স্পষ্ট, সবুজ রং ভালোমন্দ দুই অর্থেই কাঁচা। তাই আমাদের কর্মযোগীরা আর জ্ঞানযোগীরা, অর্থাৎ শাস্ত্রীর দল, আমাদের মনটিকে রাতারাতি পাকা করে তুলতে চান। তাঁদের বিশ্বাস যে, কোনোরূপ কর্ম কিংবা জ্ঞানের চাপে আমাদের হৃদয়ের রসটুকু নিংড়ে ফেলতে পারলেই আমাদের মনের রং পেকে উঠবে। তাঁদের রাগ এই যে, সবুজ বর্ণমালার অন্তস্থ বর্ণ নয়, এবং ও রং কিছুরই অন্তে আসে না— জীবনেরও নয়, বেদেরও নয়, কর্মেরও নয়, জ্ঞানেরও নয়। এঁদের চোখে সবুজ মনের প্রধান দোষ যে, সে মন পূর্বমীমাংসার অধিকার ছাড়িয়ে এসেছে এবং উত্তরমীমাংসার দেশে গিয়ে পৌঁছয় নি। এঁরা ভুলে যান যে, জোর করে পাকাতে গিয়ে আমরা শুধু হরিৎকে পীতের ঘরে টেনে আনি, প্রাণকে মৃত্যুর দ্বারস্থ করি। অপরদিকে এদেশের ভক্তিযোগীরা, অর্থাৎ কবির দল, কাঁচাকে কচি করতে চান। এঁরা চান যে, আমরা শুধু গদগদভাবে আধ-আধ কথা কই। এঁদের রাগ সবুজের সজীবতার উপর। এঁদের ইচ্ছা, সবুজের তেজটুকু বহিষ্কৃত করে দিয়ে ছাঁকা রসটুকু রাখেন। এঁরা ভুলে যান যে, পাতা কখনো আর কিশলয়ে ফিরে যেতে পারে না। প্রাণ পশ্চাৎপদ হতে জানে না; তার ধর্ম হচ্ছে এগনো, তার লক্ষ্য হচ্ছে হয় অমৃতত্ব নয় মৃত্যু। যে মন একবার কর্মের তেজ ও জ্ঞানের ব্যোমের পরিচয় লাভ করেছে, সে এ উভয়কে অন্তরঙ্গ করবেই— কেবলমাত্র ভক্তির শান্তিজলে সে তার সমস্ত হৃদয় পূর্ণ করে রাখতে পারে না। আসল কথা হচ্ছে, তারিখ এগিয়ে কিংবা পিছিয়ে দিয়ে যৌবনকে ফাঁকি দেওয়া যায় না। এ উভয়ের সমবেত চেষ্টার ফল দাঁড়িয়েছে এই যে, বাঙালির মন এখন অর্ধেক অকালপক্ক, এবং অর্ধেক অযথা-কচি। আমাদের আশা আছে যে, সবুজ ক্রমে পেকে লাল হয়ে উঠবে। কিন্তু আমাদের অন্তরের আজকের সবুজরস কালকের লালরক্তে তবেই পরিণত হবে, যদি আমরা স্বধর্মের পরিচয় পাই, এবং প্রাণপণে তার চর্চা করি। আমরা তাই দেশী কি বিলেতি পাথরে-গড়া সরস্বতীর মূর্তির পরিবর্তে বাংলার কাব্যমন্দিরে দেশের মাটির ঘট-স্থাপনা করে তার মধ্যে সবুজপত্রের প্রতিষ্ঠা করতে চাই। কিন্তু এ মন্দিরের কোনো

গর্ভমন্দির থাকবে না, কারণ সবুজের পূর্ণ অভিব্যক্তির জন্য আলো চাই আর বাতাস চাই। অন্ধকারে সবুজ ভয়ে নীল হয়ে যায়; বন্ধ ঘরে সবুজ দুঃখে পাণ্ডু হয়ে যায়। আমাদের নব-মন্দিরের চারিদিকের অবারিত দ্বার দিয়ে প্রাণবায়ুর সঙ্গেসঙ্গে বিশ্বের যত আলো অবাধে প্রবেশ করতে পারবে। শুধু তাই নয়, এ মন্দিরে সকল বর্ণের প্রবেশের সমান অধিকার থাকবে। উষার গোলাপি, আকাশের নীল, সন্ধ্যার লাল, মেঘের নীললোহিত, বিরোধালংকারস্বরূপে সবুজপত্রের গাত্রে সংলগ্ন হয়ে তার মরকতদ্যুতি কখনো উজ্জ্বল কখনো কোমল করে তুলবে। সে মন্দিরে স্থান হবে না কেবল শুষ্কপত্রের।

বৈশাখ ১৩২১।

বীরবলের চিঠি

মহারাজা শ্রীযুক্ত জগদিন্দ্রনাথ রায়,

'মানসী'সম্পাদক মহাশয় করকমলেষু

মানসী যে সম্পাদকসঙ্ঘের হাত থেকে উদ্ধারলাভ করে অতঃপর রাজ-আশ্রয় গ্রহণ করেছে, এতে আমি খুশি ; কেননা, এদেশে পুরাকালে কি হত তা পুরাতত্ত্ববিদেরা বলতে পারেন কিন্তু একালে যে সব জিনিসই পঞ্চায়তের হাতে পঞ্চত্ব লাভ করে, সেবিষয়ে আর কোনো সন্দেহ নেই।

আমার খুশি হবার একটি বিশেষ কারণ এই যে— আমার জন্য মানসী যা করেছেন, অন্য কোনো পত্রিকা তা করেন নি। অপরে আমার লেখা ছাপান, মানসী আমার ছবিও ছাপিয়েছেন। লেখা নিজে লিখতে হয়, ছবি অন্যে তুলে নেয়। প্রথমটির জন্য নিজের পরিশ্রম চাই, ছবি সম্বন্ধে কষ্ট অপরের— যিনি আঁকেন ও যিনি দেখেন।

তাই আপনি মানসীর সম্পাদকীয় ভার নেওয়াতে আমি ষোলোআনা খুশি হতুম, যদি আপনি ছাপাবার জন্য আমার কাছে লেখা না চেয়ে আলেখ্য চাইতেন। এর কারণ পূর্বেই উল্লেখ করেছি। রাজাজ্ঞা সর্বথা শিরোধার্য হলেও সর্বদা পালন করা সম্ভব নয়। রাজার আদেশে মুখ বন্ধ করা সহজ, খোলা কঠিন। পৃথিবীতে সাহিত্য কেন, সকল ক্ষেত্রেই নিষেধ-মান্য-করা বিধি-অনুসরণ-করার চাইতে অনেক সহজসাধ্য। 'এর ওর হাতে জল খেয়ো না'— এই নিষেধ প্রতিপালন ক'রেই ব্রাহ্মণজাতি আজও টিঁকে আছেন, বেদ-অধ্যয়নের বিধি পালন করতে বাধ্য হলে কবে মারা যেতেন।

সে যাই হোক, একথা সত্য যে, আমার মত লেখকের সাহায্যে সাহিত্য-জগতের কোনো কাজ কিংবা কাগজ সম্পাদন করা যায় না ; কেননা, আমি সরস্বতীর মন্দিরের পূজারী নই, স্বেচ্ছাসেবক। স্বেচ্ছাসেবার যতই কেন গুণ থাকুক-না, তার মহাদোষ এই যে, সে-সেবার উপর বারোমাস নির্ভর করা চলে না। আর মাসিকপত্রিকা নামে মাসিক হলেও, আসলে বারোমেসে। তাছাড়া পত্রের প্রত্যাশায় কেউ শিমুলগাছের কাছে ঘেঁষে না ; এবং আমি যে সাহিত্য-উদ্যানের একটি শাল্মলীতরু, তার প্রমাণ আমার গদ্যপদ্যেই পাওয়া যায়। লোকে বলে, আমার লেখার গায়ে কাঁটা, আর মাথায় মধুহীন গন্ধহীন ফুল।

আর-একটি কথা। সম্প্রতি কোনো বিশেষ কারণে প্রতিদিন আমার কাছে শ্রীপঞ্চমী হয়ে উঠেছে ; মনে হয় কলম না ছোঁয়াটাই সরস্বতীপূজার প্রকৃষ্ট উপায়। এর কারণ নিম্নে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করছি।

আপনি জানেন যে, লেখকমাত্রেরই একটি বিশেষ ধরণ আছে, সেই নিজস্ব ধরণে রচনা করাই তার পক্ষে স্বাভাবিক এবং কর্তব্য। পরের ঢঙের নকল করে শুধু সং। যা লিখতে আমি আনন্দ লাভ করি নে তা পড়তে যে পাঠকে আনন্দ লাভ করবেন, যে লেখায় আমার শিক্ষা নেই সে লেখায় যে পাঠকের শিক্ষা হবে, এত বড় মিথ্যা কথাতে আমি বিশ্বাস করি নে। আমার দেহমনের ভঙ্গিটি আমার চিরসঙ্গী, সেটিকে ত্যাগ করা অসম্ভব বললেও অত্যুক্তি হবে না। সমালোচকদের তাড়নায় লেখার ভঙ্গিটি ছাড়ার চাইতে লেখা ছাড়া ঢের সহজ; অথচ সমালোচকদের মনোরঞ্জন করতে হলে হয়ত আমার লেখার ঢং বদলাতে হবে।

আমার কলমের মুখে অক্ষরগুলো সহজেই একটু বাঁকা হয়ে বেরোয়। আমি সেগুলি সিধে করতে চেষ্টা না ক'রে যেদিকে তাদের সহজ গতি সেইদিকেই ঝোঁক দিই। কিন্তু এর দরুণ আমার লেখা এত বঙ্কিম হয়ে উঠেছে যে, তা ফারসি বলে কারও ভ্রম হতে পারে— এ সন্দেহ আমার মনে কখনো উদয় হয় নি। অথচ আমার বাংলা যে কারও-কারও কাছে ফারসি কিংবা আরবি হয়ে উঠেছে, তার প্রমাণ মানসীতেই পাওয়া যায়। আমি নোবেল প্রাইজ নিয়ে যে একটু রসিকতা করবার প্রয়াস পেয়েছিলুম, মানসীর সমালোচক তা তত্ত্বকথাহিসাবে অগ্রাহ্য করেছেন। যদি কেউ রসিকতাকে রসিকতা ব'লে না বোঝেন, তাহলে আমি নিরুপায়; কারণ তর্ক করে তা বুঝানো যায় না। যেকথা একবার জমিয়ে বলা গেছে, তার আর ফেনিয়ে ব্যাখ্যা করা চলে না।

এ অবস্থায় যদি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি যে, আমার কপালে অরসিকে রসনিবেদন 'মা লিখ, মা লিখ, মা লিখ', তাহলে সমালোচকেরাও আমাকে বলবেন, 'মা লিখ, মা লিখ, মা লিখ'। এঁদের উপদেশ অনুসারে রসিকতা করার অভ্যাসটা ত্যাগ করতে রাজি আছি, যদি কেউ আমাকে এ ভরসা দিতে পারেন যে, সত্যকথা বললে এঁরা তা রসিকতা মনে করবেন না। সে ভরসা কি আপনি দিতে পারেন?

লোকে বলে সাহিত্যের উদ্দেশ্য, হয় লোকের মনোরঞ্জন করা, নয় শিক্ষা দেওয়া। আমার বিশ্বাস সাহিত্যের উদ্দেশ্য দুই নয়, এক। এক্ষেত্রে উপায়ে ও উদ্দেশ্যে কোনো প্রভেদ নেই। এই শিক্ষার কথাটাই ধরা যাক। সাহিত্যের শিক্ষা ও স্কুলের শিক্ষা এক নয়। সাহিত্যে লেখক ও পাঠকের সম্বন্ধ গুরুশিষ্যের সম্বন্ধ নয়, বয়স্যের সম্বন্ধ। সুতরাং সাহিত্যে নিরানন্দ শিক্ষার স্থান নেই। অপরদিকে, যেকথার ভিতর সত্য নেই, তা ছেলের মন ভোলাতে পারে কিন্তু মানুষের মনোরঞ্জন করতে পারে না।

রহস্য করে যাদের মনোরঞ্জন করতে পারলুম না, স্পষ্ট কথা বলে যে তাঁদের মনোরঞ্জন করতে পারব— এ হচ্ছে আশা ছেড়ে আশা রাখা। আর, কথায় যদি মানুষের মনই না পাওয়া যায়, তাহলে সেকথা বিড়ম্বনা মাত্র। ভয় তো ঐখানেই।

সত্যকথা সুস্থ মনের পক্ষে আহার— রুচিকরও বটে, পুষ্টিকরও বটে, কিন্তু রুগ্‌ণ মনের পক্ষে তা ঔষধ, তাতে উপকার যা তা পরে হবে— পেটে গেলে, তাও আবার যদি লাগে; কিন্তু গলাধঃকরণ করবার সময় তা কটুকষায়। বাংলার মনোরাজ্যেও ম্যালেরিয়া যে মোটেই নেই, এরূপ আমার ধারণা নয়। সুতরাং সাদাভাবে সিধে কথা বলতে আমি ভয় পাই।

রসিকতা ছাড়লে আমাকে 'চিন্তাশীল' লেখক হতে হবে— অর্থাৎ অতি গম্ভীর-ভাবে অতি সাধুভাষায় বারবার হয়কে নয় এবং নয়কে হয় বলতে হবে। কারণ, যা প্রত্যক্ষ তাকেই যদি সত্য বলি, তাহলে আর গবেষণার কি পরিচয় দিলুম। কিন্তু আমার পক্ষে ওরূপ করা সহজ নয়। ভগবান, আমার বিশ্বাস, মানুষকে চোখ দিয়েছেন চেয়ে দেখবার জন্য— তাতে ঠুলি পরবার জন্য নয়। সে ঠুলির নাম দর্শন দিলেও তা অগ্রাহ্য। শুনতে পাই, চোখে ঠুলি না দিলে গোরুতে ঘানি ঘোরায় না। একথা যদি সত্য হয়, তাহলে যাঁরা সংসারের ঘানি ঘোরাবার জন্য ব্যস্ত, লেখকেরা তাঁদের জন্য সাহিত্যের ঠুলি প্রস্তুত করতে পারেন, কিন্তু আমি তা পারব না। কেননা, আমি ও ঘানিতে নিজেকেও জুতে দিতে চাই নে, অপর কাউকেও নয়। আমি চাই অপরের চোখের সে ঠুলি খুলে দিতে; শুধু শিং-বাঁকানোর ভয়ে নিরস্ত হই। ফলে দাঁড়াল এই যে, রসিকতা করা নিরাপদ নয়, আর সত্য কথা বলাতে বিপদ আছে।

দুটি-একটি উদাহরণ দিলেই বুঝতে পারবেন যে, আমি ঠিক কথা বলছি। বাঙালি যুবকের পক্ষে সমুদ্রযাত্রার পথে প্রতিবন্ধক যে ধর্ম নয় কিন্তু অর্থ, এ প্রত্যক্ষ সত্য; কারণ তাঁদের কাছে ধর্মের তত্ত্ব গুহায় নিহিত, এবং অর্ণবযানেরা যে পথে যাতায়াত করে স এব পন্থা। অথচ এইকথা বলতে গেলে সমগ্র ব্রাহ্মণ-মহাসভা এসে আমার স্কন্ধে ভর করবেন।

স্নেহলতা যে-চিতায় নিজের দেহ ভস্মসাৎ করেছেন, সে-চিতার আগুনের আঁচ যে সমগ্র সমাজের গায়ে অল্পবিস্তর লেগেছে, সেবিষয়ে আর সন্দেহ নেই। কারণ কুমারীদাহ-ব্যাপারটি এদেশে নতুন, ও উপলক্ষ্যে এখনো আমরা ঢাকঢোল বাজাতে শিখি নি। কিন্তু তাই বলে যাঁদের দেখা যাচ্ছে অত্যন্ত গাত্রজ্বালা হয়েছে, তাঁরাও যে সেই চিতাভস্ম গায়ে মেখে বিবাগী হয়ে যাবেন, এরূপ বিশ্বাস আমার নয়।

যে আগুন আজ সমাজের মনে জ্বলে উঠেছে, সে হচ্ছে খড়ের আগুন— দপ্ করে জ্বলে উঠে আবার অমনি নিভে যাবে। আজ ঝোঁকের মাথায় মনে-মনে যিনি যতই কঠিন পণ করুন না কেন, তার একটিও টিঁকবে না— থাকবে শুধু বরপণ। যতদিন সমাজ বাল্যবিবাহকে বৈধ এবং অসবর্ণ-বিবাহকে নিষিদ্ধ বলে মেনে নেবেন, ততদিন মানুষকে বাধ্য হয়ে বরপণ দিতেও হবে এবং নিতেও হবে। বিবাহাদি সম্বন্ধে অত সংকীর্ণ জাতিধর্ম রাখতে হলে ব্যক্তিগত অর্থ থাকা চাই। এ সত্য অঙ্ক কষে প্রমাণ করা যায়। মূলকথা এই যে, সনাতন প্রথা বর্তমানে সংসারযাত্রার পক্ষে অচল। এবং অচলের চলন করতে গিয়েই আমাদের দুর্গতি। কিন্তু এইকথা বললে সমাজ হয়তো আমার জন্য তুষানলের ব্যবস্থা করবেন।

মোদ্দাকথা এই যে, বাজেকথা শুনলে লোকে মুখ অন্ধকার করে, এবং কাজের কথা শুনলে চোখ লাল করে। এ অবস্থায় 'বোবার শত্রু নেই' এই শাস্ত্রবচন অনুসারে চুপ করে থাকাই শ্রেয়। সম্ভবত ভারতবর্ষে পুরাকালের অবস্থা এই একই রকমেরই ছিল, এবং সেইজন্যই সেকালে জ্ঞানীরা মুনি হতেন।

বৈশাখ ১৩২১

'যৌবনে দাও রাজটিকা'

গতমাসের সবুজপত্রে শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত যৌবনকে রাজটিকা দেবার প্রস্তাব করেছেন। আমার কোনো টীকাকার বন্ধু এই প্রস্তাবের বক্ষ্যমাণরূপ ব্যাখ্যা করেছেন—

যৌবনকে টিকা দেওয়া অবশ্যকর্তব্য, তাহাকে বসন্তের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য। এস্থলে রাজটিকা অর্থ—রাজা অর্থাৎ যৌবনের শাসনকর্তাকর্তৃক তাহার উপকারার্থে দত্ত যে টিকা, সেই টিকা। উক্তপদ তৃতীয়াতৎপুরুষ সমাসে সিদ্ধ হইয়াছে।

উল্লিখিত ভাষ্য আমি রহস্য বলে মনে করতুম, যদি-না আমার জানা থাকত যে, এদেশে জ্ঞানীব্যক্তিদিগের মতে মনের বসন্তঋতু ও প্রকৃতির যৌবনকাল—দুই অশায়েস্তা, অতএব শাসনযোগ্য। এ উভয়কে জুড়িতে জুতলে আর বাগ মানানো যায় না; অতএব এদের প্রথমে পৃথক করে পরে পরাজিত করতে হয়।

বসন্তের স্পর্শে ধরণীর সর্বাঙ্গ শিউরে ওঠে; অবশ্য তাই বলে পৃথিবী তার আলিঙ্গন হতে মুক্তিলাভ করবার চেষ্টা করে না, এবং পোষমাসকেও বারোমাস পুষে রাখে না। শীতকে অতিক্রম করে বসন্তের কাছে আত্মসমর্পণ করায় প্রকৃতি যে অর্বাচীনতার পরিচয় দেয় না, তার পরিচয় ফলে।

প্রকৃতির যৌবন শাসনযোগ্য হলেও তাকে শাসন করবার ক্ষমতা মানুষের হাতে নেই; কেননা, প্রকৃতির ধর্ম মানবধর্মশাস্ত্রবহির্ভূত। সেই কারণে জ্ঞানীব্যক্তিরা আমাদের প্রকৃতির দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে বারণ করেন, এবং নিত্যই আমাদের প্রকৃতির উলটো টান টানতে পরামর্শ দেন; এই কারণেই মানুষের যৌবনকে বসন্তের প্রভাব হতে দূরে রাখা আবশ্যক। অন্যথা, যৌবন ও বসন্ত এ দুয়ের আবির্ভাব যে একই দৈবীশক্তির লীলা—এইরূপ একটি বিশ্বাস আমাদের মনে স্থানলাভ করতে পারে।

এদেশে লোকে যে যৌবনের কপালে রাজটিকার পরিবর্তে তার পৃষ্ঠে রাজদণ্ড প্রয়োগ করতে সদাই প্রস্তুত, সেবিষয়ে আর-কোনো সন্দেহ নেই। এর কারণ হচ্ছে যে, আমাদের বিশ্বাস মানবজীবনে যৌবন একটা মস্ত ফাঁড়া—কোনোরকমে সেটি কাটিয়ে উঠতে পারলেই বাঁচা যায়। এ অবস্থায় কি জ্ঞানী, কি অজ্ঞানী সকলেই চান যে, একলম্ফে বাল্য হতে বার্ধক্যে উত্তীর্ণ হন। যৌবনের নামে আমরা ভয় পাই, কেননা তার অন্তরে শক্তি আছে। অপরপক্ষে বালকের মনে শক্তি নেই, বালকের জ্ঞান নেই, বৃদ্ধের প্রাণ নেই। তাই আমাদের নিয়ত চেষ্টা হচ্ছে, দেহের জড়তার সঙ্গে মনের

জড়তার মিলন করা, অজ্ঞতার সঙ্গে বিজ্ঞতার সন্ধিস্থাপন করা। তাই আমাদের শিক্ষানীতির উদ্দেশ্য হচ্ছে ইঁচড়ে পাকানো, আর আমাদের সমাজনীতির উদ্দেশ্য হচ্ছে জাগ দিয়ে পাকানো।

আমাদের উপরোক্ত চেষ্টা যে ব্যর্থ হয় নি, তার প্রমাণ আমাদের সামাজিক জীবন। আজকের দিনে এদেশে রাজনীতির ক্ষেত্রে একদিকে বালক, অপরদিকে বৃদ্ধ; সাহিত্য-ক্ষেত্রে একদিকে স্কুলবয়, অপরদিকে স্কুলমাস্টার; সমাজে একদিকে বাল্যবিবাহ, অপরদিকে অকালমৃত্যু; ধর্মক্ষেত্রে একদিকে শুধু 'ইতি ইতি', অপরদিকে শুধু 'নেতি নেতি'; অর্থাৎ একদিকে লোষ্ট্রকাষ্ঠও দেবতা, অপরদিকে ঈশ্বরও ব্রহ্ম নন। অর্থাৎ আমাদের জীবনগ্রন্থে প্রথমে ভূমিকা আছে, শেষে উপসংহার আছে; ভিতরে কিছু নেই। এ বিশ্বের জীবনের আদি নেই, অন্ত নেই, শুধু মধ্য আছে; কিন্তু তারই অংশীভূত আমাদের জীবনের আদি আছে, অন্ত আছে; শুধু মধ্য নেই।

বার্ধক্যকে বাল্যের পাশে এনে ফেললেও আমরা তার মিলন সাধন করতে পারি নি; কারণ ক্রিয়া বাদ দিয়ে দুটি পদকে জুড়ে এক করা যায় না। তাছাড়া যা আছে, তা নেই বললেও তার অস্তিত্ব লোপ হয়ে যায় না। এ বিশ্বকে মায়া বললেও তা অস্পৃশ্য হয়ে যায় না, এবং আত্মাকে ছায়া বললেও তা অদৃশ্য হয়ে যায় না। বরং কোনো কোনো সত্যের দিকে পিঠ ফেরালে তা অনেক সময়ে আমাদের ঘাড়ে চড়ে বসে। যে যৌবনকে আমরা সমাজে স্থান দিই নি, তা এখন নানা বিকৃতরূপে নানা ব্যক্তির দেহ অবলম্বন ক'রে রয়েছে। যাঁরা সমাজের সুমুখে জীবনের শুধু নান্দী ও ভরতবচন পাঠ করেন, তাঁদের জীবনের অভিনয়টা যবনিকার অন্তরালেই হয়ে থাকে। রুদ্ধ ও বদ্ধ করে রাখলে পদার্থমাত্রই আলোর ও বায়ুর সম্পর্ক হারায়, এবং সেইজন্য তার গায়ে কলঙ্ক ধরাও অনিবার্য। গুপ্ত জিনিসের পক্ষে দুষ্ট হওয়া স্বাভাবিক।

আমরা যে যৌবনকে গোপন করে রাখতে চাই, তার জন্য আমাদের প্রাচীন সাহিত্য অনেক পরিমাণে দায়ী। কোনো বিখ্যাত ইংরেজ লেখক বলেন যে, literature হচ্ছে criticism of life; ইংরেজিসাহিত্য জীবনের সমালোচনা হতে পারে, কিন্তু সংস্কৃতসাহিত্য হচ্ছে যৌবনের আলোচনা।

সংস্কৃতসাহিত্যে যুবকযুবতী ব্যতীত আর কারও স্থান নেই। আমাদের কাব্যরাজ্য হচ্ছে সূর্যবংশের শেষ নৃপতি অগ্নিবর্ণের রাজ্য, এবং সেদেশে হচ্ছে অষ্টাদশবর্ষ-দেশীয়াদের স্বদেশ। যৌবনের যে ছবি সংস্কৃত দৃশ্যকাব্যে ফুটে উঠেছে, সে হচ্ছে ভোগবিলাসের চিত্র। সংস্কৃতকাব্যজগৎ মাল্যচন্দনবনিতা দিয়ে গঠিত এবং সে জগতের বনিতাই হচ্ছে স্বর্গ, ও মাল্যচন্দন তার উপসর্গ। এ কাব্যজগতের স্রষ্টা কিংবা দ্রষ্টা -কবিদের মতে প্রকৃতির

কাজ হচ্ছে শুধু রমণীদেহের উপমা যোগানো, এবং পুরুষের কাজ শুধু রমণীর মন যোগানো। হিন্দুযুগের শেষকবি জয়দেব নিজের কাব্যসম্বন্ধে স্পষ্টাক্ষরে যেকথা বলেছেন, তাঁর পূর্ববর্তী কবিরাও ইঙ্গিতে সেই একই কথা বলেছেন। সেকথা এই যে, 'যদি বিলাস-কলায় কুতূহলী হও তো আমার কোমলকান্ত পদাবলী শ্রবণ করো'। এককথায় যে-যৌবন যযাতি নিজের পুত্রদের কাছে ভিক্ষা করেছিলেন, সংস্কৃতকবিরা সেই যৌবনেরই রূপগুণ বর্ণনা করেছেন।

একথা যে কত সত্য, তা একটি উদাহরণের সাহায্যে প্রমাণ করা যেতে পারে। কৌশাম্বির যুবরাজ উদয়ন এবং কপিলবাস্তুর যুবরাজ সিদ্ধার্থ উভয়ে সমসাময়িক ছিলেন। উভয়েই পরম রূপবান এবং দিব্য শক্তিশালী যুবাপুরুষ; কিন্তু উভয়ের মধ্যে প্রভেদ এইটুকু যে, একজন হচ্ছেন ভোগের আর একজন হচ্ছেন ত্যাগের পূর্ণ অবতার। ভগবান গৌতমবুদ্ধের জীবনের ব্রত ছিল মানবের মোহনাশ করে তাকে সংসারের সকল শৃঙ্খল হতে মুক্ত করা; আর বৎসরাজ উদয়নের জীবনের ব্রত ছিল ঘোষবতী বীণার সাহায্যে অরণ্যের গজকামিনী এবং অন্তঃপুরের গজগামিনীদের প্রথমে মুগ্ধ ক'রে পরে নিজের ভোগের জন্য তাদের অবরুদ্ধ করা। অথচ সংস্কৃতকাব্যে বুদ্ধচরিতের স্থান নেই, কিন্তু উদয়নকথায় তা পরিপূর্ণ।

সংস্কৃতভাষায় যে বুদ্ধের জীবনচরিত লেখা হয় নি, তা নয়; তবে ললিতবিস্তরকে আর-কেউ কাব্য বলে স্বীকার করবেন না, এবং অশ্বঘোষের নাম পর্যন্ত লুপ্ত হয়ে গেছে। অপরদিকে উদয়ন-বাসবদত্তার কথা অবলম্বন করে যাঁরা কাব্যরচনা করেছেন, যথা ভাস গুণাঢ্য সুবন্ধু ও শ্রীহর্ষ ইত্যাদি, তাঁদের বাদ দিলে সংস্কৃতসাহিত্যের অর্ধেক বাদ পড়ে যায়। কালিদাস বলেছেন যে, কৌশাম্বির গ্রামবৃদ্ধেরা উদয়নকথা শুনতে ও বলতে ভালোবাসতেন; কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, কেবল কৌশাম্বির গ্রামবৃদ্ধ কেন, সমগ্র ভারতবর্ষের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই ঐ কথা-রসের রসিক। সংস্কৃতসাহিত্য এ সত্যের পরিচয় দেয় না যে, বুদ্ধের উপদেশের বলে জাতীয় জীবনে যৌবন এনে দিয়েছিল, এবং উদয়নের দৃষ্টান্তের ফলে অনেকের যৌবনে অকালবার্ধক্য এনে দিয়েছিল। বৌদ্ধধর্মের অনুশীলনের ফলে রাজা অশোক লাভ করেছিলেন সাম্রাজ্য; আর উদয়নধর্মের অনুশীলন করে রাজা অগ্নিবর্ণ লাভ করেছিলেন রাজযক্ষ্মা। সংস্কৃতকবিরা এ সত্যটি উপেক্ষা করেছিলেন যে, ভোগের ন্যায় ত্যাগও যৌবনের ধর্ম। বার্ধক্য কিছু অর্জন করতে পারে না ব'লে কিছু বর্জনও করতে পারে না। বার্ধক্য কিছু কাড়তে পারে না ব'লে কিছু ছাড়তেও পারে না— দুটি কালো চোখের জন্যও নয়, বিশকোটি কালো লোকের জন্যও নয়।

পাছে লোকে ভুল বোঝেন বলে এখানে আমি একটি কথা বলে রাখতে চাই। কেউ মনে করবেন না যে, আমি কাউকে সংস্কৃতকাব্য বয়কট করতে বলছি কিংবা নীতি এবং রুচির দোহাই দিয়ে সে কাব্যের সংশোধিত সংস্করণ প্রকাশ করবার পরামর্শ দিচ্ছি। আমার মতে যা সত্য তা গোপন করা সুনীতি নয় এবং তা প্রকাশ করাও দুর্নীতি নয়। সংস্কৃতকাব্যে যে যৌবনধর্মের বর্ণনা আছে তা যে সামান্য মানবধর্ম— এ হচ্ছে অতি স্পষ্ট সত্য ; এবং মানবজীবনের উপর তার প্রভাব যে অতি প্রবল— তাও অস্বীকার করবার জো নেই।

তবে এই একদেশদর্শিতা ও অত্যুক্তি— ভাষায় যাকে বলে একরোখামি ও বাড়াবাড়ি— তাই হচ্ছে সংস্কৃতকাব্যের প্রধান দোষ। যৌবনের স্থূল-শরীরকে অত আশকারা দিলে তা উত্তরোত্তর স্থূল হতে স্থূলতর হয়ে ওঠে, এবং সেইসঙ্গে তার সূক্ষ্ম শরীরটি সূক্ষ্ম হতে এত সূক্ষ্মতম হয়ে উঠে যে, তা খুঁজে পাওয়াই ভার হয়। সংস্কৃতসাহিত্যের অবনতির সময় কাব্যে রক্তমাংসের পরিমাণ এত বেড়ে গিয়েছিল যে, তার ভিতর আত্মার পরিচয় দিতে হলে সেই রক্তমাংসের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করা ছাড়া আর আমাদের উপায় নেই। দেহকে অতটা প্রাধান্য দিলে মনপদার্থটি বিগড়ে যায় ; তার ফলে দেহ ও মন পৃথক হয়ে যায় এবং উভয়ের মধ্যে আত্মীয়তার পরিবর্তে জ্ঞাতিশত্রুতা জন্মায়। সম্ভবত বৌদ্ধধর্মের নিরামিষের প্রতিবাদস্বরূপ হিন্দু কবিরা তাঁদের কাব্যে এতটা আমিষের আমদানি করেছিলেন। কিন্তু যে কারণেই হোক প্রাচীন ভারতবর্ষের চিন্তার রাজ্যে দেহমনের পরস্পরের যে বিচ্ছেদ ঘটেছিল, তার প্রমাণ— প্রাচীন সমাজের একদিকে বিলাসী অপরদিকে সন্ন্যাসী, একদিকে পত্তন অপরদিকে বন, একদিকে রঙ্গালয় অপরদিকে হিমালয় ; এককথায় একদিকে কামশাস্ত্র অপরদিকে মোক্ষশাস্ত্র। মাঝামাঝি আর-কিছু জীবনে থাকতে পারত কিন্তু সাহিত্যে নেই। এবং এ দুই বিরুদ্ধ-মনোভাবের পরস্পরমিলনের যে কোনো পন্থা ছিল না, সেকথা ভর্তৃহরি স্পষ্টাক্ষরে বলেছেন—

'একা ভার্যা সুন্দরী বা দরী বা'

এই হচ্ছে প্রাচীনযুগের শেষকথা। যাঁরা দরী-প্রাণ তাঁদের পক্ষে যৌবনের নিন্দা করা যেমন স্বাভাবিক, যাঁরা সুন্দরী-প্রাণ তাঁদের পক্ষেও তেমনি স্বাভাবিক। যতির মুখের যৌবন-নিন্দা অপেক্ষা কবির মুখের যৌবন-নিন্দার, আমার বিশ্বাস, অধিক ঝাঁঝ আছে। তার কারণ, ত্যাগীর অপেক্ষা ভোগীরা অভ্যাসবশত কথায় ও কাজে বেশি অসংযত।

যাঁরা স্ত্রীজাতিকে কেবলমাত্র ভোগের সামগ্রী মনে করেন, তাঁরাই যে স্ত্রী-নিন্দার

ওস্তাদ— এর প্রমাণ জীবনে ও সাহিত্যে নিত্য পাওয়া যায়। স্ত্রী-নিন্দুকের রাজা হচ্ছেন রাজকবি ভর্তৃহরি ও রাজকবি সোলোমন। চরম ভোগবিলাসে পরম চরিতার্থতা লাভ করতে না পেরে এঁরা শেষবয়সে স্ত্রীজাতির উপর গায়ের ঝাল ঝেড়েছেন। যাঁরা বনিতাকে মাল্যচন্দনহিসাবে ব্যবহার করেন, তাঁরা শুকিয়ে গেলে সেই বনিতাকে মাল্যচন্দনের মতই ভূতলে নিক্ষেপ করেন, এবং তাকে পদদলিত করতেও সংকুচিত হন না। প্রথমবয়সে মধুর রস অতিমাত্রায় চর্চা করলে শেষবয়সে জীবন তিতো হয়ে ওঠে। এ শ্রেণীর লোকের হাতে শৃঙ্গার-শতকের পরেই বৈরাগ্য-শতক রচিত হয়।

একই কারণে, যাঁরা যৌবনকে কেবলমাত্র ভোগের উপকরণ মনে করেন, তাঁদের মুখে যৌবন-নিন্দা লেগে থাকবারই কথা। যাঁরা যৌবন-জোয়ারে গা-ভাসিয়ে দেন, তাঁরা ভাটার সময় পাঁকে পড়ে গত জোয়ারের প্রতি কটুকাটব্য প্রয়োগ করেন। যৌবনের উপর তাঁদের রাগ এই যে, তা পালিয়ে যায় এবং একবার চলে গেলে আর ফেরে না। যযাতি যদি পুরুর কাছে ভিক্ষা করে যৌবন ফিরে না পেতেন, তাহলে তিনি যে কাব্য কিংবা ধর্মশাস্ত্র রচনা করতেন, তাতে যে কি সুতীব্র যৌবননিন্দা থাকত— তা আমরা কল্পনাও করতে পারি নে। পুরু যে পিতৃভক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন, তার ভিতর পিতার প্রতি কতটা ভক্তি ছিল এবং তাতে পিতারই যে উপকার করা হয়েছিল, তা বলতে পারি নে, কিন্তু তাতে দেশের মহা অপকার হয়েছে; কারণ নীতির একখানা বড় গ্রন্থ মারা গেছে।

যযাতি-কাঙ্খিত যৌবনের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ এই যে, তা অনিত্য। এবিষয়ে ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ, নগ্নক্ষপণক ও নাগরিক, সকলেই একমত।

যৌবন ক্ষণস্থায়ী, এই আক্ষেপে এদেশের কাব্য ও সংগীত পরিপূর্ণ—

'ফাগুন গয়ী হয়, বহুরা ফিরি আয়ী হয়
গয়ে রে যোবন, ফিরি আওত নাহি'

এই গান আজও হিন্দুস্থানের পথে-ঘাটে অতি করুণ সুরে গাওয়া হয়ে থাকে। যৌবন যে চিরদিন থাকে না, এ আপসোস রাখবার স্থান ভারতবর্ষে নেই।

যা অতি প্রিয় এবং অতি ক্ষণস্থায়ী, তার স্থায়িত্ব বাড়াবার চেষ্টা মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। সম্ভবত নিজেব অধিকার বিস্তার করবার উদ্দেশ্যেই এদেশে যৌবন শৈশবের উপর আক্রমণ করেছিল। বাল্যবিবাহের মূলে হয়তো এই যৌবনের মেয়াদ বাড়াবার ইচ্ছাটাই বর্তমান। জীবনের গতিটি উলটো দিকে ফেরাবার ভিতরও একটা মহা আর্ট আছে। পৃথিবীর অপরসব দেশে লোকে গাছকে কি করে বড় করতে

হয় তারই সন্ধান জানে, কিন্তু গাছকে কি করে ছোট করতে হয় সে কৌশল শুধু জাপানিরাই জানে। একটি বটগাছকে তারা চিরজীবন একটি টবের ভিতর পুরে রেখে দিতে পারে। শুনতে পাই, এইসব বামন-বট হচ্ছে অক্ষয়বট। জাপানিদের বিশ্বাস যে, গাছকে হ্রস্ব করলে তা আর বৃদ্ধ হয় না। সম্ভবত আমাদেরও মনুষ্যত্বের চর্চা সম্বন্ধে এই জাপানি আর্ট জানা আছে, এবং বাল্যবিবাহ হচ্ছে সেই আর্টের একটি প্রধান অঙ্গ। এবং উক্ত কারণেই অপরসকল প্রাচীন সমাজ উৎসন্নে গেলেও আমাদের সমাজ আজও টিঁকে আছে। মনুষ্যত্ব খর্ব ক'রে মানব-সমাজটাকে টবে জিয়িয়ে রাখায় যে বিশেষ-কিছু অহংকার করবার আছে, তা আমার মনে হয় না। সে যাই হোক, এ যুগে যখন কেউ যৌবনকে রাজটিকা দেবার প্রস্তাব করেন, তখন তিনি সমাজের কথা ভাবেন, ব্যক্তিবিশেষের কথা নয়।

ব্যক্তিগত হিসেবে জীবন ও যৌবন অনিত্য হলেও মানবসমাজের হিসেবে ও দুই পদার্থ নিত্য বললেও অত্যুক্তি হয় না। সুতরাং সামাজিক জীবনে যৌবনের প্রতিষ্ঠা করা মানুষের ক্ষমতার বহির্ভূত না হলেও না হতে পারে।

কি উপায়ে যৌবনকে সমাজের যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করা যেতে পারে, তাই হচ্ছে বিবেচ্য ও বিচার্য।

এ বিচার করবার সময় এ কথাটি মনে রাখা আবশ্যক যে, মানবজীবনের পূর্ণ অভিব্যক্তি— যৌবন।

যৌবনে মানুষের বাহেন্দ্রিয় কর্মেন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয় সব সজাগ ও সবল হয়ে ওঠে, এবং সৃষ্টির মূলে যে প্রেরণা আছে, মানুষের সেই প্রেরণা তার সকল অঙ্গে, সকল মনে অনুভব করে।

দেহ ও মনের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধের উপর মানবজীবন প্রতিষ্ঠিত হলেও দেহমনের পার্থক্যের উপরেই আমাদের চিন্তারাজ্য প্রতিষ্ঠিত। দেহের যৌবনের সঙ্গে মনের যৌবনের একটা যোগাযোগ থাকলেও দৈহিক যৌবন ও মানসিক যৌবন স্বতন্ত্র। এই মানসিক যৌবন লাভ করতে পারলেই আমরা তা সমাজে প্রতিষ্ঠা করতে পারব। দেহ সংকীর্ণ ও পরিচ্ছন্ন; মন উদার ও ব্যাপক। একের দেহের যৌবন অপরের দেহে প্রবেশ করিয়ে দেবার জো নেই; কিন্তু একের মনের যৌবন লক্ষ লোকের মনে সংক্রমণ করে দেওয়া যেতে পারে।

পূর্বে বলেছি যে, দেহ ও মনের সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য। একমাত্র প্রাণশক্তিই জড় ও চৈতন্যের যোগ সাধন করে। যেখানে প্রাণ নেই, সেখানে জড়ে ও চৈতন্যে মিলনও দেখা যায় না। প্রাণই আমাদের দেহ ও মনের মধ্যে মধ্যস্থতা করছে। প্রাণের

পায়ের নীচে হচ্ছে জড়জগৎ, আর তার মাথার উপরে মনোজগৎ। প্রাণের ধর্ম যে, জীবনপ্রবাহ রক্ষা করা, নবনব সৃষ্টির দ্বারা সৃষ্টি রক্ষা করা— এটি সর্বলোকবিদিত। কিন্তু প্রাণের আর-একটি বিশেষ ধর্ম আছে, যা সকলের কাছে সমান প্রত্যক্ষ নয়। সেটি হচ্ছে এই যে, প্রাণ প্রতিমুহূর্তে রূপান্তরিত হয়। হিন্দুদর্শনের মতে জীবের প্রাণময় কোষ, অন্নময় কোষ ও মনোময় কোষের মধ্যে অবস্থিত। প্রাণের গতি উভয়মুখী। প্রাণের পক্ষে মনোময় কোষে ওঠা এবং অন্নময় কোষে নামা দুই সম্ভব। প্রাণ অধোগতি প্রাপ্ত হয়ে জড়জগতের অন্তর্ভূত হয়ে যায়; আর উন্নত হয়ে মনোজগতের অন্তর্ভূত হয়। মনকে প্রাণের পরিণতি এবং জড়কে প্রাণের বিকৃতি বললেও অত্যুক্তি হয় না। প্রাণের স্বাভাবিক গতি হচ্ছে মনোজগতের দিকে; প্রাণের স্বাধীন স্ফূর্তিতে বাধা দিলেই তা জড়তাপ্রাপ্ত হয়। প্রাণ নিজের অভিব্যক্তির নিয়ম নিজে গড়ে নেয়; বাইরের নিয়মে তাকে বদ্ধ করাতেই সে জড়জগতের অধীন হয়ে পড়ে। যেমন প্রাণীজগতের রক্ষার জন্য নিত্য নূতন প্রাণের সৃষ্টি আবশ্যক, এবং সে সৃষ্টির জন্য দেহের যৌবন চাই; তেমনি মনোজগতের এবং তদধীন কর্মজগতের রক্ষার জন্য সেখানেও নিত্য নব সৃষ্টির আবশ্যক, এবং সে সৃষ্টির জন্য মনের যৌবন চাই। পুরাতনকে আঁকড়ে থাকাই বার্ধক্য অর্থাৎ জড়তা। মানসিক যৌবন লাভের জন্য প্রথম আবশ্যক, প্রাণশক্তি যে দৈবী শক্তি— এই বিশ্বাস।

এই মানসিক যৌবনই সমাজে প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে আমাদের উদ্দেশ্য। এবং কি উপায়ে তা সাধিত হতে পারে, তাই হচ্ছে আলোচ্য।

আমরা সমগ্র সমাজকে একটি ব্যক্তিহিসেবে দেখলেও আসলে মানবসমাজ হচ্ছে বহুব্যক্তির সমষ্টি। যে সমাজে বহু ব্যক্তির মানসিক যৌবন আছে, সেই সমাজেরই যৌবন আছে। দেহের যৌবনের সঙ্গেসঙ্গেই মনের যৌবনের আবির্ভাব হয়। সেই মানসিক যৌবনকে স্থায়ী করতে হলে শৈশব নয়, বার্ধক্যের দেশ আক্রমণ এবং অধিকার করতে হয়। দেহের যৌবনের অন্তে বার্ধক্যের রাজ্যে যৌবনের অধিকার বিস্তার করবার শক্তি আমরা সমাজ হতেই সংগ্রহ করতে পারি। ব্যক্তিগত জীবনে ফাল্গুন একবার চলে গেলে আবার ফিরে আসে না; কিন্তু সমগ্র সমাজে ফাল্গুন চিরদিন বিরাজ করছে। সমাজে নূতন প্রাণ, নূতন মন, নিত্য জন্মলাভ করছে। অর্থাৎ নূতন সুখদুঃখ, নূতন আশা, নূতন ভালোবাসা, নূতন কর্তব্য ও নূতন চিন্তা নিত্য উদয় হচ্ছে। সমগ্র সমাজের এই জীবনপ্রবাহ যিনি নিজের অন্তরে টেনে নিতে পারবেন, তার মনের যৌবনের আর ক্ষয়ের আশঙ্কা নেই। এবং তিনিই আবার কথায় ও কাজে সেই যৌবন সমাজকে ফিরিয়ে দিতে পারবেন।

এ যৌবনের কপালে রাজটিকা দিতে আপত্তি করবেন, এক জড়বাদী আর এক মায়াবাদী; কারণ এঁরা উভয়েই একমন। এঁরা উভয়েই বিশ্ব হতে অস্থির প্রাণটুকু বার করে দিয়ে যে এক স্থিরতত্ত্ব লাভ করেন, তাকে জড়ই বল আর চৈতন্যই বল, সে বস্তু হচ্ছে এক, প্রভেদ যা তা নামে।

জ্যৈষ্ঠ ১৩২১